ওষুধ কোম্পানি ও ডাক্তারের যোগসাজশ

আলমগীর খান

বাংলাদেশে চিকিৎসা খাতের উন্নতির ধরন এমন যে এতে বিনিয়োগ বাড়ছে, ব্যয়বহুল বাণিজ্যিক হাসপাতাল ও পরীক্ষা কেন্দ্র বাড়ছে, জনগণের চিকিৎসা ব্যয় বাড়ছে, সাথে সাথে জিডিপিও বাড়ছে কিন্তু নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা দুর্লভ হয়ে ওঠছে। এতো উন্নতির কথা বলা হলেও রাষ্ট্রপতিকে জনগণের টাকায় কিছুদিন পরপরই মেডিক্যাল চেকআপের জন্য বিদেশে যেতে দেখা যায়! মন্ত্রী আমলাদের চিকিৎসাও বিদেশেই। এই লেখা এই পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

গত বছর পত্রিকার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, অনেক রোগীর চিকিৎসা ব্যয় বহন করার সামর্থ্য নেই। চিকিৎসার নামে অনেক রোগী হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। এক শ্রেণির চিকিৎসক বিনা প্রয়োজনে রোগীদের মেডিক্যাল টেস্ট করাতে দেন। তিনি বলেন, কিছু কিছু ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, জনগণ চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসা অথবা তাঁর চিকিৎসায় অবহেলার শিকার হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা পেশার মান নিশ্চিত করতে মেডিক্যাল এথিকস কোড মেনে চলতে তিনি চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।[১]

তারও আগে ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেককে চমকে দিয়েছিলেন, যখন ১১টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করে যেন 'রোগী মারা ডাক্তার' তৈরি না হয় এদিকে সবাইকে লক্ষ রাখতে হবে।[২]

যেসব দেশের মানুষকে সবচেয়ে বেশি যার যার গাঁটের পয়সা খরচ করে চিকিৎসাসেবা নিতে হয়, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষের দিকে। এখানে প্রতি ৩ টাকা ব্যয়ের ২ টাকা ব্যক্তির নিজের, বাকিটা সরকারি ও অন্যান্য উৎস থেকে। আশপাশের অনেক দেশের মধ্যে আমরা এক্ষেত্রে সবার ওপরে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন হেলথ ইকোনমিকস ইউনিটের পরিচালনায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টসের ওপর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, স্বাস্থ্যসেবায় মোট ব্যয়ের মধ্যে প্রতি ১০০ টাকায় বাংলাদেশে জনগণের গাঁটের পয়সা খরচ হয় ৬৭ টাকা। অন্যদিকে এই খরচ মালদ্বীপে ১৮%, ভুটানে ২৫%, নেপালে ৪৭%, পাকিস্তানে ৫৬% ও ভারতে ৬২%। আর যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে এই খরচ যথাক্রমে ৯% ও ১১%। হেলথ ইকোনমিকস ইউনিটের তৎকালীন মহাসচিব আসাদুল ইসলাম স্বাস্থ্যসেবায় এই ব্যক্তিগত পর্যায়ের ব্যয়বৃদ্ধির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ চিকিৎসা, ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় প্যাথলজিক্যাল টেস্ট ইত্যাদিকে।[৩]

সম্প্রতি আরটিভির এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আমাদের দেশে ৭০ শতাংশ প্রসূতিকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করানো হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাবিউএইচও) আদর্শগত মানের দিক থেকে এটা অনেক বেশি। বিশেষ করে প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে প্রসূতির অস্ত্রোপচারের হারটা বেশি। অস্ত্রোপচার সব সময় প্রয়োজন হয় না। প্রাইভেট ক্লিনিক কিংবা হাসপাতালগুলো বাণিজ্যিক কারণেই প্রসূতির অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করে থাকে। ৩০ মার্চ মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার কৈট্টা এলাকায় প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।[৪]

আমাদের দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা ও চিকিৎসক সম্পর্কে ওপরে যেসব মূল্যায়ন ও তথ্য দেয়া হল তার সবই গণমাধ্যমের বরাতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া। অতএব আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থার করুণ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার এই দিক নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

আবার সম্প্রতি সময় টেলিভিশনের অনুষ্ঠান 'বদ্যিবাড়ি'র ৬৭ পর্বে ডা. লেনিন চৌধুরী বলেন, ডাক্তাররা দ্রুত রোগ সারানোর জন্য, ভাল ডাক্তার হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য এবং কখনও কখনও রোগীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে অনাবশ্যক অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে যে পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক লেখা হয় তার ৫০ শতাংশ অপ্রয়োজনীয়। অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, দেশে নিম্নমানের ওষুধ জীবাণুর অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।[৫]

অবশ্য উলিখিত দুজন চিকিৎসকই অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য প্রধানত হাতুড়ে ডাক্তারদের চিকিৎসা, মানুষের অসচেতনতা, ওষুধের দোকানে ওষুধ বিক্রেতাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা না থাকা ও প্রয়োগের অভাবকে দায়ী করেছেন। কিন্তু চিকিৎসকরা নিজেরাই যখন নানা কারণে যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক লিখে থাকেন এবং ওষুধই নিম্নমানের হয় সেক্ষেত্রে করণীয় কী? এ সেই পুরনো প্রশ্ন : কুইনাইন জ্বর সারাবে, কিন্তু কুইনাইন সারাবে কে? বা সরষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে তো ভূত ছাড়াবে কে?

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নৈতিকতার প্রশ্ন

জ্ঞান-বিজ্ঞান নৈতিকতা-নিরপেক্ষ নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। মানুষের উপকার-নিরপেক্ষ কিছু জ্ঞান থাকতে পারে, যেমন– শুদ্ধ জ্যামিতিক বা গাণিতিক জ্ঞান, তাই বলে ক্ষতিকারক কোন জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। আর শুদ্ধ গাণিতিক জ্ঞানেরও ফলিত রূপের উদ্দেশ্য সেই একই– মানবকল্যাণ। তাই বলে যে জ্ঞানকে মানুষের ক্ষতির কাজে ব্যবহার করা যায় না, তা নয়; বরং হরহামেশাই তা করা হয়। জ্ঞানকে যে শক্তি মনে করা হয়, তার কারণ এই। জ্ঞান শুধু শক্তি হিসেবে নয়, এমনকি রীতিমত ভয়ংকর শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুঁজিবাদী সমাজে এটি ব্যবহৃত হয় পুঁজির লেজুড় হিসেবে। প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান যে নৈতিকতা-নিরপেক্ষ হতে পারে না, তা বেশি স্পষ্ট চিকিৎসাশাস্ত্রের বেলায়। মানুষের অসুস্থতা দূর করার উদ্দেশ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ। তার কাজ সরাসরি মানুষের জীবন নিয়ে। অতএব এই শাস্ত্র শুরু থেকেই নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০ থেকে ৩৭০) তাই চিকিৎসকদের জন্য একটি শপথ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে গেছেন। আধুনিক কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পৃথিবীর চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলোতে সেই শপথের বিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু মূল বাণীটি একই– কোন ক্ষুদ্র স্বার্থকে অবলম্বন না করে মানুষের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধনের জন্য কাজ করা চিকিৎসকের দায়িত্ব।

পুঁজির লেজুড়বৃত্তিতে চিকিৎসাশাস্ত্র

কিন্তু চিকিৎসকগণ অনেক সময় তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। কারণ যে জ্ঞান ও পেশাগত চর্চায় তাঁরা নিয়োজিত তা পুঁজিবাদের হাতের পুতুল। মূলধারার চিকিৎসাব্যবস্থা পুঁজির সেবায় বিকশিত হয়েছে, মুনাফা যার মূল লক্ষ্য। চিকিৎসাব্যবস্থা আপনাআপনি মানবতার সেবা করে

না, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন দিয়ে সেটা করতে তাকে বাধ্য করা হয়। চিকিৎসকদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাও গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকদের নৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনা এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের শক্ত ভিত্তি ছাড়া মূলধারার চিকিৎসাব্যবস্থার সঙ্গে মানবতার সম্পর্ক সামান্যই। এ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক ও নিয়ন্ত্রক হচ্ছে ওষুধ কোম্পানিরা।

পুঁজি এমনই একটা শক্তি, যাকে বিশ্বাস করা যায় না। সে প্রেম থেকে শুরু করে মানুষের জীবন পর্যন্ত সবকিছুকেই পণ্যে পরিণত করতে চেষ্টা করে। আর তাই আধুনিক উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও শিক্ষা ও চিকিৎসার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খাতে ছেড়ে দেয়া হয় না। গুরুত্বপূর্ণ জনসেবার খাতসমূহ প্রধানত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। শিক্ষা ও চিকিৎসার মত মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়গুলো ব্যক্তিগত খাতে ছেড়ে রাখলে তা অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সৃষ্টি হয় ওষুধ কোম্পানির একাধিপত্য। কয়েকজন ব্যক্তির মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মানুষের জীবন হয়ে পড়ে পণ্য।

বিশ্বাসের অভাব ও মানসিক দূরত্ব

যেসব দেশের চিকিৎসাব্যবস্থায় এমন অবাধ লুণ্ঠনের রাজত্ব কায়েম হয়েছে সেখানে যাদের সুযোগ আছে তারা চিকিৎসা নিতে অন্য দেশে পাড়ি দেয়। বাংলাদেশ থেকে একটা বিরাটসংখ্যক রোগী প্রতিবছর চিকিৎসার জন্য ভারত, সিঙ্গাপুর, ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যায় এজন্যই। এর ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশি হাসপাতালগুলো আয় করে। আশ্চর্য ব্যাপার হল, মূলধারার চিকিৎসাবিজ্ঞান সারা বিশ্বে একই, সকল দেশে একই বই পড়ে সবাই ডাক্তার হয়। বাংলাদেশে আবার ইংরেজিতে লেখা বই পড়ে ডাক্তার হতে হয়, মাতৃভাষায় নয়। একই বই পড়ে এদেশে যাঁরা ডাক্তার হন, মানুষ তাঁদেরকে বিশ্বাস করে না কেন? এদেশের রোগীরা যেন ঠেকায় পড়ে এদেশের ডাক্তারের কাছে যায়, পয়সা ও সুযোগ থাকলে মনে হয় সবাই বিদেশ থেকে চিকিৎসা করে আসত। কেন? এই দুরবস্থার জন্য রোগী, না চিকিৎসাব্যবস্থা, কে দায়ী?

কে দায়ী তা বুঝতে আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থার মধ্যকার কয়েকটি গলদ প্রথমেই উল্লেখ করা যায়। সবার আগে বলা প্রয়োজন, আমাদের দেশের ডাক্তাররা রোগীর ভাষায় কথা বলেন না। তাঁদের কথা বলার নিজস্ব ভাষা আছে। তাঁরা অনেকেই রোগীদের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর বা রোগের ব্যাখ্যা ইংরেজিতে দেন, আর প্রেসক্রিপশন লেখেন যে ইংরেজি অক্ষরে তা বোঝার সাধ্য ইংরেজের বাপেরও নেই। চিকিৎসকের কাছাকাছি দোকানের ওষুধ বিক্রেতা ছাড়া সাধারণত কেউ তা বোঝে না। স্পষ্টতই ডাক্তারের সবচেয়ে কাছের মানুষ ওষুধ বিক্রেতা। ওষুধ বিক্রেতার কাজ ওষুধ কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করা। ওষুধ বিক্রেতাকে মাঝখানে রেখে আমাদের দেশের বিরাটসংখ্যক ডাক্তার এ কাজটাই করেন। একটু তলিয়ে দেখলেও ব্যাপারটা তা-ই দেখা যায়।

ওষুধ কোম্পানি ও চিকিৎসকদের প্রেমের সম্পর্ক

২০১২ সালে বাংলাদেশের স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট থেকে কুমার বিশ্বজিৎ সূত্রধর, অনামিকা সাহা, নাজ হাসান হুদা, রিয়াজ উদ্দিন প্রমুখ ওrrational Use of Antibiotics and Antibiotic Resistance in Southern Rural Bangladesh: Perspectives from Both the Physicians and Patients শীর্ষক একটি গবেষণা করেছিলেন। গবেষণায় ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের ২৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ১১২টি ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে জরিপ করা হয়েছিল। প্রতিবেদন থেকে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের বিপজ্জনক অবস্থার কথা ছাড়াও চিকিৎসক ও ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাঝে অসাধু লেনদেনের সম্পর্কের বিষয়টি জানা যায়। যদিও এটি খুবই প্রকাশ্য এক গোপন ব্যাপার, ওপেন-সিক্রেট।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, "বর্তমানে ওষুধ কোম্পানি হচ্ছে একমাত্র সংগঠন, যেখান থেকে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ তাঁদের তথ্য পেয়ে থাকেন। আর এসব সরবরাহকৃত তথ্য জনস্বাস্থ্য সংস্থাসমূহের প্রদত্ত সুপারিশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নগদ টাকায় ঘুষ ছাড়াও বিরাটসংখ্যক ডাক্তার বিদেশ ভ্রমণের জন্য বিনা মূল্যে বিমান টিকেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, এয়ারকন্ডিশনার, টেবিল লাইট, টেলিফোন, তোয়ালে ইত্যাদিসহ বিভিন্ন উপহারসামগ্রী পেয়ে থাকেন।"[৬]

অবশ্য সমস্যাটা বাংলাদেশে চিকিৎসাব্যবস্থার একার নয়। সংকটটা মূলধারার চিকিৎসাব্যবস্থার গোড়ায়, তাই অন্য দেশেও কমবেশি বিদ্যমান। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পার্দু ফার্মা এলপির কথা উল্লেখ করা যায়। এই ওষুধ কোম্পানির তৈরি অক্সি-কনটিন নামের ওপিয়ড অনেক মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। এজন্য ২০০৭ সালে পার্দু ও তার তিন কর্মকর্তাকে ৬৩৪০ লক্ষ ডলার জরিমানা দিতে হয়। এই ক্ষতিকারক ওষুধটি বিক্রি করে তারা আয় করেছে ৩১০০ কোটি ডলার। আসলে অন্যান্য ওষুধ কোম্পানি থেকে পার্দু তেমন আলাদা নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পার্দু ফার্মা এলপির কথা উল্লেখ করা যায়। এই ওষুধ কোম্পানির তৈরি অক্সি-কনটিন নামের ওপিয়ড অনেক মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। এজন্য ২০০৭ সালে পার্দু ও তার তিন কর্মকর্তাকে ৬৩৪০ লক্ষ ডলার জরিমানা দিতে হয়। এই ক্ষতিকারক ওষুধটি বিক্রি করে তারা আয় করেছে ৩১০০ কোটি ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ো-এথিকসের অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার একটি লেখায় পার্দু ফার্মার এসব অপকর্ম সম্পর্কে বলেছেন। অক্সি-কনটিনের ব্যাবসায়িক সাফল্যের পেছনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। ওষুধের প্রচারণার অনেক সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশল আছে। তার বিক্রয়কর্মীরা সভা-সম্মেলনের নামে ডাক্তারদের আকর্ষণীয় স্থানসমূহে বেড়াতে নিয়ে যেত। আলোচক হিসেবে তাঁদের সম্মানী দেয়ার নামে ঘুষ দেয়া হত। বিক্রয়কর্মীরা যে যে ডাক্তারের সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধের নাম দেখে তাদের কমিশন দেয়া হত। ভাল বিক্রয়কর্মীর বোনাস ২ হাজার ডলারের ওপরে হয়েছে।[৭]

আমাদের দেশে অবস্থা এর চেয়ে খারাপ। একটা ব্যক্তিগত ঘটনা বলি। একবার এক ডাক্তারের চেম্বার থেকে আমি বের হলাম। কয়েকজন বিক্রয় প্রতিনিধি এসে আমাকে ঘিরে ধরলেন। এমন ঘটনা যে প্রায় সময়ই হয়, তা সবাই জানেন। তাঁরা প্রত্যেকে আমার প্রেসক্রিশন দেখতে চান এবং মোবাইলে ছবি তুলতে চান। আমি দিতে চাচ্ছিলাম না। একজন খুব বেশি কাতরভাবে অনুরোধ করছিলেন। আমি তাঁদের একজনকে বললাম, 'কেন আপনাকে এই প্রেসক্রিশন দেখাব, বলেন। আপনারাই আমাদের রোগীদের সমস্যা। কারণ ডাক্তার তো আমার রোগ সারানোর জন্য ওষুধ লেখে নাই, লিখেছে আপনার বলে দেয়া ওষুধগুলো। ওষুধ লিখেছে আপনার জন্য, আমার জন্য নয়।'

অনেক ডাক্তারের ভূমিকা থেকে তাঁদের ওষুধ বিক্রেতার চেয়ে বেশি কিছু ভাবা যায় না। শুধু তাঁরা ক্ষমতায় একটু বেশি। ওষুধের দোকানের একজন বিক্রয়কর্মী আমি যা চাইব তা-ই দেবে, বেশি বা কম নয়। কিন্তু ডাক্তাররা রোগীকে দিয়ে তাঁদের পছন্দমত ওষুধ কিনতে বাধ্য করবে। কেননা একজন ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় অসহায় থাকে এবং ডাক্তারকে সে বিশ্বাস করে।

অনেক চিকিৎসকই রোগীর এই পবিত্র বিশ্বাসকে টাকা উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন প্রেসক্রিপশনে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধের নাম লিখে, এমনকি অপারেশন করেও, যা আরও ভয়ংকর।

গার্ডিয়ান পত্রিকায় সারা বোসলি লিখেছেন, ভোক্তা সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন কনজ্যুমার ইন্টারন্যাশনাল একটি গবেষণায় জানায়, ওষুধ কোম্পানিগুলো গবেষণায় যে অর্থ ব্যয় করে তার দ্বিগুণ ব্যয় করে তাদের উৎপাদিত ওষুধ বাজারজাতকরণে। যেসব কোম্পানিকে হিসাবে নেয়া হয়েছে তাদের অর্ধেকের বেশি ক্ষেত্রে দেখা গেছে, চিকিৎসকদের সঙ্গে তাদের প্রশ্নসাপেক্ষ সম্পর্ক। জার্মান ও ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষ ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় কোম্পানি গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইনের সঙ্গে ডাক্তারদের যোগসাজশমূলক দুর্নীতির তদন্ত করে। দেখা গেছে, ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে এই ওষুধ কোম্পানিটি ডাক্তারদের ১৫৬০ লক্ষ ডলার দামের জিনিসপত্র অবৈধভাবে উপহার হিসেবে দিয়েছে।[৮]

ডাক্তার কার– রোগীর না ওষুধ কোম্পানির?

আমাদের দেশের চিকিৎসার অবস্থা এর চেয়ে ভাল হওয়ার কোন কারণ দেখি না, খারাপ হতে পারে। ডাক্তার তুমি কার–প্রশ্নটির উত্তর তাই জরুরি। শিক্ষা-চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকারের বিষয়সমূহে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার বন্ধ করে সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হতে হবে মুখ্য। আর যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এইসব মৌলিক সেবা প্রদানের সঙ্গে জড়িত তাঁদের উন্নত নৈতিক চেতনা থাকা প্রয়োজন।

একজন চিকিৎসকের উন্নত নৈতিক চেতনা কেমন হওয়া দরকার তার অনেক উদাহরণ আমাদের প্রাক-লুণ্ঠনবাদী সমাজে আছে। এখনও আছে, তবে তা কম। সে হচ্ছে ডাকহরকরা, হাতুড়ে ডাক্তার ও পন্ডিত শ্রেণির কাল। সেই কাল মোটেও এখনকার মত উন্নত ছিল না। কিন্তু পোস্টাল কর্মী, চিকিৎসক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এখনকার চেয়ে বেশি সচেতন ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতাটি তখনকার ডাক বিভাগের একজন কর্মীকে নিয়েই লেখা সম্ভব, এখনকার কাউকে নিয়ে অসম্ভব।

> ভোক্তা সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন কনজ্যুমার ইন্টারন্যাশনাল একটি গবেষণায় জানায়, ওষুধ কোম্পানিগুলো গবেষণায় যে অর্থ ব্যয় করে তার দ্বিগুণ ব্যয় করে তাদের উৎপাদিত ওষুধ বাজারজাতকরণে।

হাতুড়ে ডাক্তার বলে আজ যাঁদের গড়পড়তা অবজ্ঞা করা হয়, সে আমলে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও মানুষের সেবাদানকে তাঁরা ব্যবসা হিসেবে নেননি। তাঁদের ছিল কঠোর পেশাগত দায়িত্ববোধ ও উন্নত নৈতিক চেতনা। গ্রামে কোন তথাকথিত হাতুড়ে ডাক্তার মারা গেলে গ্রামবাসীদের অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়ত, শোকার্ত হয়ে উঠত পুরো গ্রাম, এমন নজির অনেক। আজ তা কল্পনাও করা যায় না। কারণ ডাক্তার ও রোগীর মাঝে যে আত্মার বন্ধন ছিল, তা আজ টাকার সম্পর্কে রূপান্তরিত। চিকিৎসাব্যবস্থা এখন উন্নত হয়েছে, কিন্তু সেবাটা চলে গেছে যার টাকা আছে তার দরজায়।

চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্ব

একজন চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্ব কেমন হওয়া উচিত তার একটা ছবি মহান রুশ লেখক আন্তন চেকভের 'আয়না' গল্পে পাওয়া যায়। গল্পে এক ভূস্বামীর অবিবাহিতা কন্যা নেলী একদিন হাতে ধরা আয়নার ভেতর তাকিয়ে ডুবে যায় কল্পনার অতলান্ত সাগরে। কল্পনায় দেখা মেলে তার স্বপ্নের পুরুষের, এবং তারা বিয়ে করে। কল্পনায়ই হঠাৎ বহুদিন পর এক শীতের রাতে সে নিজেকে আবিষ্কার করে সিভিল সার্জন স্টিফেন লুকিচের দরজায়। ডাক্তারের বাড়ি যেতে হয়েছিল, কারণ পরম প্রিয় স্বামী ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত। ডাক্তারও দিনরাত টাইফাসে আক্রান্ত রোগী দেখে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি কিছুতেই এত রাতে আর তিরিশ মাইল অতিক্রম করে নেলীর স্বামীর চিকিৎসা করতে যেতে পারবেন না। তিনি নেলীকে অনুরোধ করেন জেমস্তভো ডাক্তারের কাছে যেতে, যা আরও কুড়ি মাইল দূরে। নেলীর জন্য এখন যা অসম্ভব। সে সকল কিছুর বিনিময়ে লুকিচকে নিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞা করেছে। কারণ স্বামীই তার জীবন। সবকিছুতে ব্যর্থ হয়ে সে শেষ অবলম্বন হিসেবে ডাক্তারের দায়িত্ববোধ নিয়ে তাঁর বিবেকের কাছে প্রশ্ন তোলে। বাধ্য হয়ে ডাক্তার লুকিচ রওনা দেন নেলীর সঙ্গে। ভোরে নেলীর বাড়িতে এসে ডাক্তার লুকিচ রোগীকে দেখার আগেই আবার ক্লান্ত শরীরে শুয়ে পড়েন। নেলী আতঙ্কিত হয়ে দেখে ডাক্তার লুকিচ প্রলাপ বকছেন। কারণ তিনি অত্যধিক ক্লান্ত আর নিজেও নেলীর স্বামীর মতই অসুস্থ। অগত্যা নেলীকে আবার ছুটতে হয় জেমস্তভো ডাক্তারের বাড়ি। কারণ প্রাণপ্রিয় স্বামীকে তার বাঁচাতেই হবে।

দেখা যায়, ডাক্তার লুকিচ নিজে অসুস্থ হয়েও শেষ পর্যন্ত রোগীকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি। তিনি অন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে চেষ্টা করেছেন তাকে ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু নেলী যখন তাঁর নৈতিক দায়িত্বের প্রশ্ন তুলেছে, তখন না যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে আজকালকার কোন নেলী স্বামীকে ডাক্তার দেখানোর স্বপ্নটা কিছুতেই এভাবে দেখতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য, চেকভ নিজেও ছিলেন চিকিৎসক, যদিও এ পেশায় তিনি তাঁর জীবিকা নির্বাহ করেননি।[৯]

নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও অনেক মহান চিকিৎসক আছেন। কিন্তু যখন চিকিৎসাব্যবস্থার কাঠামোতে সংকট, তখন ব্যক্তিগত ভালমানুষি খুব একটা কার্যকর হয় না। প্রয়োজন ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন। তবে এজন্য সবার আগে বোঝা প্রয়োজন– চিকিৎসক রোগীর জন্য, ওষুধ কোম্পানির জন্য নয়। যেখানে বিষয়টি মানুষের জীবন-মৃত্যুর, চিকিৎসকের বেলায় নৈতিক বোধ ও দায়িত্বের প্রশ্নটি সেখানে সবচেয়ে জরুরি। তবে ওষুধ কোম্পানি ও ডাক্তারের অনৈতিক প্রেমের সম্পর্কে বাদ না সেধে এবং তাকে বিচ্ছেদের নাটকে রূপান্তর না করে কোনটাই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আলমগীর খান : নির্বাহী সম্পাদক, শিক্ষালোক।
ইমেইল : alamgirhkhan@gmail.com

তথ্যসূত্র

১। চিকিৎসকদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি : বিনা প্রয়োজনে রোগীদের টেস্ট করাবেন না, সমকাল প্রতিবেদন, ১ এপ্রিল ২০১৮
২। 'রোগী মারা ডাক্তার' যেন তৈরি না হয় : প্রধানমন্ত্রী, ভোরের কাগজ প্রতিবেদন, ১১ জানুয়ারি ২০১৫
৩। People fork out most, দ্য ডেইলি স্টার প্রতিবেদন, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৪। https://www.rtvonline.com/country/64504
৫। https://www.facebook.com/watch/?v=575884976249223
৬। http://www.journalrepository.org/media/journals/ARRB_32/2014/Jan/Sutradhar492013ARRB8184_1.pdf
৭। Peter Singer, 'Dirty Money and Tainted Philanthropy', Project Syndicate, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
৮। Sarah Boseley, 'Drug firms a danger to health', The Guardian, ২৬ জুন ২০০৬
৯। আলমগীর খান, আন্তন চেকভের গল্প 'আয়না' : ঠিকরে আসা আলো, সাপ্তাহিক, ১৭ জানুয়ারি ২০১৯